দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 আগ 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

042

নামী-দামী পরীক্ষার্থী আর চলাও নকল

মানিকগঞ্জ সরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষ পড়েছেন ফাঁপড়ে। কলেজটি অন্যতম কেন্দ্র হয়েছে চলতি বছর ডি পরীক্ষার। কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী দের অধিকাংশই আশ্রয় নিচ্ছেন নকলের। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, একেবারে সরাসরি। অকুতোভয় এই পরীক্ষার্থীদের বাগ মানাতে ব্যর্থ হয়েছেন ব্যবস্থাপকেরা। বাধ্য হয়েই অগত্যা নালিশ ঠুকেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে। সুপারিশ জানিয়েছেন, কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে। সুপারিশ করেছেন স্মারকলিপির আকারে। বলেছেন 'এমন ব্যাপক নকলবাজিতে কলেজের শিক্ষকেরা পরিদর্শকের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশ করেছেন।'

কেন্দ্র অবশ্য বন্ধ করা হয়নি তবে 'নকলবাজদের' বিরুদ্ধে 'নিয়মানুযায়ী' ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নকল-প্রসঙ্গ নতুন নয়। বিশেষ করে হাল-আমলের পরীক্ষাগুলোর বেশির ভাগেই নকল যেন হালফাশন। এজন্য কেন্দ্র পরিবর্তন, কলেজ পরিবর্তন থেকে আরম্ভ করে সকল চাতুর্যই হালাল মনে করেন? আর ঠিক এ কারণেই বাইরের চেষ্টায় নকল ঠেকানো সহজ হচ্ছে না—বরঞ্চ দিনকে দিন বাড়ছেই। প্রত্যন্ত এলাকায় এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে নীরব দর্শক সেজে থাকা ছাড়া গত্যন্তরই নেই। এই সর্বনাশা প্রবনতার বিরুদ্ধে বিবেকবান মানুষমাত্রই সোচ্চার।

আলোচ্য পরীক্ষা পরিধি ব্যাপক নয়, বিপুলে নয় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, সাধারণত এসব পরীক্ষা অনেকটা নিঃশব্দেই যেন হয়ে যায়। একমাত্র সংশ্লিষ্টরা বা একটু এসব নিয়ে মাথা ঘামায়। অথচ কিনা এবার 'সংবাদ' হলো এই পরীক্ষাটিও। এর চমকপ্রদ দিক হলো পরীক্ষার্থীদের কিছুসংখ্যকের সামাজিক ও পেশাগত অবস্থান। তারা মাত্রই দলে দলে পড়া-মুখস্ত করা তরুণ অপরিণামদর্শী ভীরু শিক্ষার্থীটি নন। তারা অনেকেই প্রশাসনের উঁচু পদের জন্যে গণ্য জন, আরও মজা হচ্ছে এদের অনেকেই অন্যান্য পরীক্ষায় নকল-টকল ঠেকানোর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিরস্কার নয় শুধু প্রয়োজনে বহিষ্কারও করেন। এখন আইন-পরীক্ষা দিতে বসে তারই নাকি ঐ অনভিপ্রেত কাজটি নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে— ব্যক্তি যে-ই হোন না কেন, পরীক্ষা দিতে পরীক্ষার হলে গেলে তিনি পরীক্ষার্থী বই আর কেউ তো নন। দূর-দূর: বক্ষ, কি হয়, কি হয় আতংক, পাস হব কি হব না— এমন সব স্বাভাবিক শংকা মথিত করে তাকেও। অতএব, 'অধিকাংশের পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তির ধ্বজা তুলে ধরার প্রবণতা ভর করতে পারে তার উপরও। এ কারণে ব্যক্তি-কর্মী পদস্থ কর্মকর্তাটিও তার কর্মজীবনের নীতি শিকেয় তুলে ক্ষণিকের জন্য ভিড়ের মানুষ বনে যান। যেতে পারেন।

আসলে কি তাই?

কর্মের দায়-ই কি মানুষের কাছে প্রধান নয়? পেশার পরিচয় নিয়েই কি একজন সমাজে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত নন? প্রয়োজনের তীব্রতা কি তা আড়াল করতে পারে— নাকি তেমন পারার কথা ওঠে? যে দায়িত্বে রয়েছে নকলের মতো অনৈতিক প্রবণতা ও পন্থা রোধের ব্যবস্থায়, সে দায়িত্ব-বোধ কি উবে যেতে পারে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে? এতে সাময়িক ও সংকীর্ণ হতে পারে কি নীতির প্রতি শ্রদ্ধা. কখনোই না, তা-ই প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে কারও কারও সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে, তা যদি সত্যি হয়, তবে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে পারা যায় না।

ভেবে দেখুন, তিনচারঘন্টা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী হিসাবে যিনি নকল করে লিখে উত্তরে এলেন, তিনি কোন ভাষায় পরবর্তী পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে গিয়ে নকলকারীর বিরুদ্ধে কঠোর হবেন? ছোট্ট ও নির্দিষ্ট একটু স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে বিভ্রান্তির আশ্রয়ী তিনি হলেন, তা কি স্থায়ী-ভাবে তার জন্য লোকসানই বয়ে আনল না?

লোকসান কি তার একার? তার বা মুষ্টিমেয় তাদের ক'জনের জন্য বিড়ম্বিত হতে হবে তাদের সম্প্রদায়ের সকলকেই। সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি সর্বসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধাই তো প্রশাসনযন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ, কঠোরঘাত পড়বে সেখানেই।

এও সত্য, খবরে বর্ণিত প্রশাসক-পরীক্ষার্থীদের নকল করা অংশটিকে একতরফা দায়ী করা ঠিক হচ্ছে না। তাদের কপাল মন্দ, তারা লুকোচুরি করলেন না। অথবা কায়ক্লেশ করাটা এড়াতে পারলেন না। যদি নকলের জন্য অমন প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রত্যয়ী তারা না হতেন. কিংবা যদি কোনও মতে গোপনে কাজটি সেরেই ফেলতে পারতেন, তবে তারা বক্ষ স্ফীত করে ভবিষ্যতে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে পারতেন। এখনও যে পারবেন না—তা নয়। দশে মিলে করা কাজে লাজ-সংকোচ নিতান্তই অস্থায়ী ব্যাপার। এছাড়া 'সময়' এমনি জাদুকর যা সব ভুলিয়ে দেয়। কাজেই কে কোথায় কবে কী করেছেন— তা গেজেটিয়ারে লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। কেবল স্থান-কালই যথেষ্ট। নাঃ, দেশটি যতো ভাবা যায়, ততো ছোট নয়। আর জনসংখ্যা? ভিড়াক্রান্ত এ দেশে কে কাকে চিনে রাখে চিরদিনের জন্য?

বড় বিচিত্র মানবধর্ম। ছাত্র-কালের ক্লাস-পালানো, টিউটোরিয়াল ফাঁকি দেয়া। একাধিকক্রমে প্রক্সি দিতে থাকা ছাত্রটি শিক্ষাঙ্গনের চৌকাঠ ডিঙিয়েই মহামানবে পরিণত হয়ে যায়। একদা লাঠি-পেটানো সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েই নিরুপম ব্যক্তিত্ব বনে যান, তারপর মোটা চশমা আর মোটা বইয়ের আড়ালে অপরূপ ব্যঞ্জনা তৈরি করে নীতিমালা নিয়ে খৈ ফোটান। সবাই এমন নন, বেশির ভাগই নন। তবু যারা ছিলেন, তারা রূপ বদলে ফেলে কথাবার্তাও পাল্টে ফেলেন। কে আর কাকে বলতে আসে!

কিন্তু এ-তো খারাপ নয়। যখন অ-ভালোকে অবাঞ্ছিত রূপে চিহ্নিত করার ক্ষমতা ও মানসিকতা আসে, তখন তা উচ্চারণের-ও অধিকার থাকে। আদর্শকে আঁকড়ে তার জন্য উচ্চকণ্ঠ হওয়ার মর্যাদাও আছে।

কিন্তু, যারা পাশাপাশি দু'ধারার প্রবর্তক? অথবা সমর্থক? মুখে এক, কাজে আরেক? সমস্যা তারাই। নিজের বেলা এক নিয়ম, অন্যের বেলা অন্য-নিয়ম। এমন ধারণা যাদের, তারা ভয়ংকর। যে কোনো ব্যাপারেই নিয়ম আছে। এ নিয়ম সমষ্টির স্বার্থে, সামগ্রিক কল্যাণে। এ নিয়ম পালনে ব্যক্তি কমী হওয়ার অবকাশ নেই। যারা নিজেদের 'আলাদা' মনে করেন, তারা বুঝতে হবে, নিয়ম ভাঙছেন। নিয়ম ভঙ্গকারী কেবল নিন্দনীয় নন, ব্যাপক বিশৃংখলাকারীও, কেননা তার বা তাদের দৃষ্টান্তে দুষ্টজনেরা উৎসাহ বোধ করে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিতে প্ররোচিত হয়ে ওঠে।

মানুষ ফেরেশতা নয়। কিন্তু না-জেনে ভুল করা আর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অন্যায় কাজ করা এক নয়, নয় বলেই তারা সমালোচনার,—দুষ্কর্মের ভার অনুযায়ী ধিক্কারের।

সাধারণ পারিবারিক জীবনে আমাদের মিথ্যাচারণ নেই, একথা বলা কঠিন। অথচ 'মিথ্যা বলা মহাপাপ' এতো বাল্যপাঠ। আচরণের বৈপরীত্যে শিশু কিশোর-মন একদিকে বিক্ষুব্ধ ও অন্যদিকে প্রলুব্ধ হতে থাকে তাদের অবচেতন থেকেই। ফলে এর যে পরিণাম—তা বলে শেষ করার উপায় নেই।

সে যাক। এ মুহূর্তে জিজ্ঞাসা জাগছে, আমরা সচেতনে সজ্ঞানে করছিটা কি? জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ কী ধরনের সর্বনাশা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি? মানিকগঞ্জের আলোচ্য আইন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের দায়িত্ববান একটি অংশের দায়িত্বহীন আচরণ তো বৃহত্তর সমাজের সামান্য প্রতিফলন মাত্র—গোটা সমাজ জুড়েই যে আজ এমন বৈপরীত্য, এমন অসামঞ্জস্য, আত্মপর কার্যের চিত্র?

বিষয়টি উড়িয়ে দেয়ার নয়। আমি তুমি, আমরা তোমরা এ নিশ্চিতে যদি চলে উচিত্যের ও ন্যায়-নৈতিকতার দোলাখেলা, তবে শেষ কোথায়? রেশইবা টানা যাবে কি করে? ভয়টা বড় বেশি এজন্যই।

—হোসনে আরা শাহেদ